নিমধ্যমা

মতিনউদ্দিন সাহেবকে কেন জানি কেউ পছন্দ করে না। অফিসের লোকজন করে না, বাড়ির লোকজনও না। এর কী কারণ মতিন সাহেব জানেন না। প্রায়ই তাঁর ইচ্ছা করে পরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করেন—'আচ্ছা আপনি আমাকে পছন্দ করেন না কেন ?' জিজ্ঞেস করা হয় না। তাঁর লজ্জা লাগে। মনে মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেন—থাক, কী হবে জিজ্ঞেস করে ?

তাঁর স্ত্রীকে অবশ্যি একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন। নাশতা খেতে খেতে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা, তুমি আমাকে পছন্দ করো না কেন ?

মতিন সাহেবের স্ত্রী রাহেলা বেগম তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তুমি কী বললে ?

'না—কিছু বলিনি।'

'পছন্দের কথা কী যেন বললে ?'

'মানে জানতে চাচ্ছিলাম—তুমি আমাকে পছন্দ কর কি না।'

'তোমার কি ভীমরতি হয়ে গেল না কি, আজেবাজে কথা জিজ্ঞেস করছ।'

'আর করব না।'

তাঁর স্ত্রী যে তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারেন না তা মতিন সাহেব জানেন। তিনি থাকেন একা একটা ঘরে। সেই ঘরটাও বাড়ির সবচে' খারাপ ঘর। আলো-বাতাস ঢোকে না বললেই হয়। দিনের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে কোন মেহমান চলে এলে এই ঘরও তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তখন কোথায় শোবেন তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বড় ছেলের ঘরটা সুন্দর। খাটটাও বড়। অনায়াসে দু'জন শোয়া যায়। কিন্তু শোয়া সম্ভব না—বড় ছেলে বিরক্ত হয়। ছোট দুই মেয়ে এক ঘরে শোয়, সেখানে জায়গা নেই। তিনি খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত বসার ঘরের সোফায় ঘুমুতে যান। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

গত পূজার ছুটিতে বাসার সবাই ঠিক করল দল বেঁধে কক্সবাজার যাবে। তাঁকে অবশ্যি কেউ বলল না। তিনি খাবার টেবিলে আলোচনা শুনলেন। সব খরচ দিচ্ছে তাঁর বড় ছেলে। ব্যবসায় তার ভাল লাভ হয়েছে। কিছু টাকা খরচ করতে চায়। সে হাসি মুখে বলল, 'এখান থেকে একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে, মাইক্রবাসে যাব। নিজেদের কনট্রোলে একটা গাড়ি থাকার খুব সুবিধা। ধরো, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ যেতে ইচ্ছা করল, হুট করে চলে গেলাম।'

মেজো মেয়ে নীতু বলল, কিন্তু ভাইয়া ট্রেন জার্নির আলাদা মজা। একটা পুরা কামরা রিজার্ভ করে যদি যাই...গাড়ি তুমি কক্সবাজরে ভাড়া করো। ওখানে ভাড়া পাওয়া যায় না ?

ছোট মেয়ে বলল, আমার প্লেনে যেতে ইচ্ছা করছে ভাইয়া। ঢাকা থেকে চিটাগাং পর্যন্ত ট্রেনে, সেখান থেকে প্লেনে কক্সবাজার।

এই সব আলোচনা শুনতে তাঁর খুব আনন্দ হচ্ছিল। অবশ্যি তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন না। কারণ তিনি জানেন কিছু বলতে গেলেই রাহেলা বলবেন, চুপ করো তো, তুমি জানো কী ?

মতিন সাহেব কিছু বললেন না ঠিকই কিন্তু জোগাড়-যন্ত্র করে রাখলেন। কাপড়-চোপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করিয়ে রাখলেন। অফিসে বড় সাহেবকে বললেন, আমার কয়েকদিন ছুটি লাগবে স্যার। পরিবারের সবাই কক্সবাজার যাচ্ছি।

বড় সাহেব বললেন, হঠাৎ কক্সবাজার। ব্যাপার কী ?

'বাচ্চারা ধরল—বেড়াতে যাবে। আমি বললাম, ঠিক আছে চলো। ওদের আনন্দের জন্য যাওয়া। অবশ্যি আমি নিজেও কোনদিন সমুদ্র দেখিনি। ভাবলাম দেখেই আসি...'

বলতে বলতে আনন্দে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। বড় সাহেব সাতদিনের ছুটি মঞ্জুর করলেন।

কক্সবাজার রওনা হবার আগের দিন রাহেলা এসে বললেন, আমরা সবাই কক্সবাজার যাচ্ছি জানো তো ? তোমার তো আবার কোন হুঁশ থাকে না। ঘরে কী আলোচনা হয় তাও জানো না। কাল রওনা হচ্ছি। মাইক্রোবাসে যাচ্ছি। বাস চলে আসবে ভোর ছ'টায়।

মতিন সাহেব হাসি মুখে বললেন, জানি। আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। অফিস থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়েছি। আর্নড লিভ।

রাহেলা অবাক হয়ে বললেন, তোমাকে ছুটি নিতে কে বলল ? আগ বাড়িয়ে যে এক একটা কাজ করো রাগে গা জ্বলে যায়। আমি কি বাসা খালি রেখে যাব না কি ? রোজ চুরি হচ্ছে। তুমি থাকবে এখানে।

'আচ্ছা।'

'ফ্রিজে এক সপ্তাহের মত গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। চারটা চাল ফুটিয়ে খেয়ে নেবে। পারবে না ?'

'পারব।'

'শোবার আগে সব ঘর বন্ধ হয়েছে কি না ভাল করে দেখবে। তোমার উপর কোন দায়িত্ব দিয়েও তো নিশ্চিন্ত হতে পারি না।'

এ জাতীয় ব্যাপার যে শুধু বাড়িতে ঘটে তাই না। অফিসেও নিয়মিত ঘটে। তাঁদের অফিসের এক সহকর্মী কোন-এক সিনেমায় ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। নায়িকার খুব জ্বর। ডাক্তার জ্বর দেখে বললেন—'হু, জ্বর একশ তিন।

পেসেন্টকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে হবে।' নায়িকা তখন কাতর গলায় বলে, আমি বাঁচতে চাই না ডাক্তার। মৃত্যুই আমার জন্যে ভাল। পৃথিবীর এ আলো হাওয়া, এ আনন্দ আমি সহ্য করতে পারছি না। ডাক্তার তখন বলেন, ছিঃ এমন কথা বলবেন না।

এইটুকুই পার্ট। তবু তো সিনেমার পার্ট। পরিচিত একজন সিনেমায় পার্ট করছে এটা দেখায়ও আনন্দ। যে পার্ট করছে সে বলল, বৃহস্পতিবার সে সবার জন্য পাস নিয়ে আসবে। অফিসের শেষে সবাই তার বাসায় চা-টা খেয়ে সন্ধ্যাবেলা এক সঙ্গে ছবি দেখতে যাবে।

মতিন সাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতিবারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ছবিঘরে অনেকদিন ছবি দেখা হয় না। ছবি দেখা হবে। তাছাড়া দলবল নিয়ে ছবি দেখার আনন্দও আছে। উত্তেজনায় বৃহস্পতিবারে তিনি অফিসের কাজও ঠিকমত করতে পারলেন না। ছুটির পর সবাই এক সঙ্গে বেরুচ্ছেন, সিনেমার ডাক্তার অভিনেতা মতিন সাহেবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটা ভুল হয়ে গেছে। তেরটা পাস এনেছি, এখন দেখি মানুষ চৌদ্দজন। কী করা যায় বলুন তো?

মতিন সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর খুব যেতে ইচ্ছা করছে। নিজ থেকে বলতে ইচ্ছা করছে না, 'আপনারা যান। আমি থাকি।'

'শুনুন মতিন সাহেব, আপনি বরং থাকুন। আপনাকে পরে পাস এনে দেব। আর ছবিও খুব আজেবাজে। পুরা ছবি দেখলে হলের মধ্যে বমি করে দেবেন। না দেখাই ভাল।'

মতিন সাহেব বললেন, আচ্ছা।

'মনে কিছু করলেন না তো আবার?'

'জ্বি না।'

'বাসা পর্যন্ত চলুন। এক সঙ্গে চা খাই। অসুবিধা নেই তো?'

'জ্বি না।'

শেষ পর্যন্ত বাসায় যাওয়া হল না। একটা জিপ জোগাড় হয়েছিল, সেই জিপে সবার জায়গা হল মতিন সাহেবের হল না।

'মতিন সাহেব, আপনি রবং একটা রিকশা নিয়ে চলে আসুন। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া। অসুবিধা হবে না তো?'

'জ্বি না।'

ঠিকানা নিয়ে তিনি রিকশা করে মালিবাগে নামলেন। বাসা খুঁজে পেলেন না কারণ ঠিকানায় সবই দেয়া আছে বাসার নাম্বার দেয়া নেই। মতিন সাহেবের একবার ক্ষীণ সন্দেহ হল—ইচ্ছা করেই বাসার নাম্বার দেয়নি। পর মুহূর্তেই সেই

সন্দেহ তিনি ঝেড়ে ফেলে দিলেন। তা কী করে হয়। সন্ধ্যা না মেলানো পর্যন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেন বাড়ি খুঁজে বের করবার। পারলেন না।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর চাকরির পর তিনি রিটায়ার কররেন। জুনিয়র অফিসার হিসেবে ঢুকেছিলেন, রিটায়ার করলেন সিনিয়র অফিসার হিসাবে। ত্রিশ বছরে একটিমাত্র প্রমোশন। বর্তমান অফিসের জেনারেল ম্যানেজার তাঁর সঙ্গেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন। এখন তাঁকে স্যার ডাকতে হয়। মতিন সাহেবের লজ্জা লজ্জা করে। উপায় কী ?

রিটায়ার করা উপলক্ষে অফিসে বিদায় সভার আয়োজন করা হয়েছে। অফিস শেষে বেলা সাড়ে পাঁচটায় সভা হবে। মতিন সাহেব কী বলবেন সব ভেবে রেখেছেন। ভেবে রাখা কথা সব বলতে পারবেন কি না তা জানেন না। হয়ত চোখে পানি এসে যাবে, গলা ধরে যাবে। বিকাল পাঁচটা বাজতেই তিনি হল-ঘরে বসে রইলেন। আশ্চর্য তিনি একা—একটি লোকও নেই। ছটা পর্যন্ত তিনি একা একাই বসে রইলেন। লক্ষ করলেন অফিসের লোকজন একে একে চলে যাচ্ছে। এদিকে কেউ উঁকিও দিচ্ছে না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় জি.এম. অফিস থেকে বেরুবার সময় বিস্মিত হয়ে বললেন, আরে মতিন সাহেব আপনি ? বসে আছেন কেন ?

মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, বিদায় সভা হবে এই জন্যে...

'আজ তো হবে না। আজ আমি ব্যস্ত, এই জন্যে ক্যানসেল করে দিয়েছি। আপনি নোটিশ পাননি ?'

'জ্বি না।'

'আরে বলেন কী ? আচ্ছা বাড়ি চলে যান। পরে এক সময় ফেয়ার ওয়েল হবে। আপনাকে খবর দেয়া হবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

চাকরি জীবন শেষ হয়ে অবসর জীবন শুরু এই ভেবে মতিন সাহেব এক কেজি সন্দেশ কিনে ফেললেন। হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে তাঁর ভাল লাগে। বাড়ি ফিরে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বাড়ি খালি। জনপ্রাণী নেই—আসবাবপত্র নেই। সব ধুধু করছে। রোগা একটা ছেলে বালতি ভর্তি পানি দিয়ে মেঝে ধুচ্ছে। মতিন সাহেব বললেন, ওরা কোথায় ?

ছেলেটি বলল, কারা ?

'এই বাড়িতে যারা থাকত ?'

'বাড়ি ছাইড়া নতুন বাড়িতে গেছে।'

'কোথায় গেছে ?'

'আমি ক্যামনে কই ?'

বাড়িওয়ালার কাছে খোঁজ নিয়ে জানলেন—তারা পল্লবীতে বাড়ি নিয়েছে। বড় বাড়ি। সে বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন না।

অনেক যন্ত্রণা করে রাত দশটায় পল্লবীর বাড়িতে তিনি উপস্থিত। রাহেলা খড়খড়ে গলায় বললেন, এতক্ষণে তোমার সময় হল ? আজ বাড়ি বদল হচ্ছে, কোথায় সকাল সকাল ফিরবে। সাহায্য করবে। আর তুমি কি না উদয় হয়েছ মাঝরাতে।

'বাড়ি বদল করছ জানতাম না। তুমি আমাকে কিছু বলোনি।'

'সব কিছু তোমাকে জানিয়ে তোমার অনুমতি নিয়ে করতে হবে ?'

'না তা না। মানে আমি জানতাম না যে বাড়ি বদল করছ।'

'রোজ এই নিয়ে কথা হচ্ছে। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা হচ্ছে—আর তুমি বলছ তুমি জানতে না।'

'কিছু তো বলোনি...'

'আর কীভাবে বলব ? মাইক ভাড়া করে বলতে হবে ?'

'নতুন বাড়ির ঠিকানাও জানতাম না—খুব যন্ত্রণা করে ঠিকানা বের করেছি।'

'যন্ত্রণা করে ঠিকানা বের করতে হয়েছে ? কী এমন যন্ত্রণা করেছ শুনি। হাতে ওটা কী ?'

'সন্দেশ।'

'সন্দেশ কিনলে কেন ?'

'এম্নি কিনলাম।'

'জানো এই বাড়িতে মিষ্টি কেউ খায় না—তারপরেও সন্দেশ কিনে আনলে কী মনে করে ?'

'ভুল হয়ে গেছে।'

নতুন বাসায় মতিন সাহেবের ঘর হল ছাদের চিলেকোঠায়। এই ঘরটা আগের চেয়েও ছোট তবে প্রচুর আলো-বাতাস। সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে যে কোন সময় ছাদে আসা যায়। রাতে কোন কারণে তাঁর ঘুম ভাঙলেই তিনি ছাদে এসে বসে থাকেন। তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, কেন সবাই তাঁকে এত অপছন্দ করে ? তিনি কি মানুষটা খারাপ ?

তা তো না। কখনো কোন অন্যায় করেছেন বলে তো মনে পড়ে না। সৎভাবে থেকেছেন। সৎ জীবন যাপন করেছেন।

তাহলে কি তাঁর চেহারা খারাপ ? কিংবা চেহারাটা এমন যে দেখলেই সবার রাগ লাগে ?

তাও বোধ হয় না। আয়নায় তিনি দীর্ঘ সময় নিজেকে দেখেছেন। একবার না, অনেকবার দেখেছেন। খারাপ বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া চেহারা কি খুব বড় ব্যাপার ? কত কুৎসিত দর্শন মানুষ পৃথিবীতে আছে। তাদের প্রতি কত ভালবাসা সবাই দেখায়। তাঁদের অফিসেই তো একজন আছেন, পরিমল বাবু। আগুনে পুড়ে মুখের একটা দিক ঝলসে গেছে, বাঁ চোখটা নষ্ট। তাকালে শিউরে উঠতে হয়। অথচ সবার মুখে—পরিমলদা, পরিমলদা। অফিসের পিকনিক হবে, ব্যবস্থা করবে পরিমলদা। নাটক দেখতে যাবে, ডাকো পরিমলদাকে।

তাহলে ব্যাপারটা কী ? তিনি খানিকটা বোকা বলেই কি সবাই তাকে এড়িয়ে চলে ? বোকাদের কেউ পছন্দ করে না—কিন্তু তিনি কি সত্যি বোকা ? কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। কাকে জিজ্ঞেস করবেন ? জিজ্ঞেস করবার মত কোন বন্ধু তাঁর নেই। কাজেই তিনি গভীর রাতে ছাদে বসে আকাশের তারা গোনেন।

দিনের বেলাটা তাঁর অবশ্যি খুব ভাল কাটে। সকালে নাশতা শেষ করেই বের হয়ে পড়েন। এগারোটা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করেন। বাচ্চাদের স্কুলগুলির সামনে দাঁড়ান। এক একদিন এক এক স্কুল। ছোট ছোট বাচ্চারা হৈচৈ করে স্কুলে ঢুকে। তাঁর দেখতে বড় ভাল লাগে। এগারোটার দিকে রোদ কড়া হয়ে গেলে ঘুরতে আর ভাল লাগে না। কোন একটা পার্কে চলে যান। দুপুরটা কাটে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে। দুপুরের খাবার তিনি পার্কেই খান। এক ছটাক বাদাম, এক গ্লাস পানি আর এক কাপ চা। কোন কোন দিন দুটা সিঙ্গারা, একটা কলা। সবই পার্কে পাওয়া যায়। দুপুরে তিনি যে বাড়িতে খেতে যান না এ নিয়ে কেউ তাকে কখনো কিছু বলে না।

রোদ একটু কমে গেলে বেলা চারটার দিকে তিনি আবার ঘুরতে বের হন। বাসায় ফিরে যান সন্ধ্যার দিকে—এই হচ্ছে মতিন সাহেবের রুটিন। বাসায় ফিরে জিজ্ঞেস করেন অফিস থেকে কোন চিঠি এসেছে কি না। বিদায় সভার খবরের জন্য তিনি এখনো মনে মনে অপেক্ষা করেন।

এক রোববারের কথা। চৈত্র মাস। ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে। মতিন সাহেব যথারীতি রমনা পার্কে উপস্থিত হয়েছেন। পছন্দসই একটা বেঞ্চ বের করে লম্বা হয়ে শুয়েছেন। আকাশ ঘন নীল—আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন হঠাৎ কেমন যেন হল। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ ঝাঁকুনি অনুভব করলেন। পেটের নাড়িভুঁড়ি মনে হল হঠাৎ একটা পাক দিয়েছে। মুখ ভর্তি হয়ে গেল লালায়। চোখের সামনে তীব্র নীল আলো ঝলসে উঠল।

তিনি চোখ বন্ধ করে তিনবার বললেন, ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ।

চোখ খুললেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। যা দেখলেন তার জন্যে তাঁর কোন রকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তিনি দেখলেন—তাঁর চারপাশে ছ'সাতটি শিশু। বয়স

সাত থেকে বারোর মধ্যে। প্রতিটি শিশুর মুখ এত সুন্দর যে মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা। গায়ের রঙ গোলাপি, পাতলা ঠোঁট, গা লাল রঙের। চোখের পল্লব দীর্ঘ। চোখগুলি বড় বড়। সেই চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

মতিন সাহেব চোখ মেলতেই সবগুলি বাচ্চা এক সঙ্গে কলকল করে উঠল। তারা কথা বলছে। অতি বিচিত্র কোন ভাষায় কথা বলছে। সেই বিচিত্র ভাষার এক বর্ণও তিনি বুঝতে পারছেন না। তারা কথা বলছে অতি মিষ্টি সুরে। খানিকটা টেনে টেনে। এক-একটা বাক্য বলার পর তারা বাঁ হাত চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এটাই বোধ হয় এদের কথা বলার ভঙ্গি।

এরা যে মানবশিশু এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু কোথাকার মানবশিশু ? এদের পোশাকও অতি বিচিত্র। সবারই গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পোশাক। যার রঙ কোন স্থায়ী রঙ না—ক্ষণে ক্ষণে তা বদলাচ্ছে।

মতিন সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন। বাচ্চাদের কলকল শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। চারদিক পুরোপুরি নিঃশব্দ। এধরনের নীরবতা সহ্য করাও মুশকিল। মতিন সাহেব চোখ মেললেন, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা আবার কলকল শুরু করল। এরা সবাই উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। ব্যাপার কী ঘটছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মতিন সাহেব ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন। যদিও এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল।

তিনি শুয়ে ছিলেন সিমেন্টের বেঞ্চে। এখন তিনি শুয়ে আছেন ঘাসের উপর। ঘাসগুলি অবশ্যি অন্য রকম। সবুজ নয়, হালকা নীল। ঘাসের পাতা সুতার মত সূক্ষ্ম। সিমেন্টের বেঞ্চে যখন শুয়েছিলেন তখন সূর্য ছিল মাথার উপর। এখন কোন সূর্য নেই। তিনি সূর্যের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালেন। বাচ্চারাও তার মত এদিক-ওদিক দেখছে। তিনি হাতের ইশারায় বললেন—সূর্যটা কোথায় ? বাচ্চারা কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হল না—তারাও অবিকল তাঁর মত হাতের ইশারা করল। এরা যেন একদল পুতুল। তিনি যা করবেন এরাও তাই করবে। মতিন সাহেব বললেন, 'তোমরা কারা ?'

এরা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর সবাই একসঙ্গে মিষ্টি করে বলল, 'তোমরা কারা ?'

এর মানে কী ? কী হচ্ছে এসব ? তিনি কোথায় ? আগে রমনা পার্কে শুয়ে ছিলেন—এখন যেখানে আছেন এটাও মনে হয় কোন পার্ক তবে একটা গাছও চিনতে পারছেন না। অচেনা সব গাছ তবে বড় গাছ না সবই লতানো গাছ। পাতাগুলির বেশির ভাগই গোলাকার। প্রতিটি গাছ ফুলে ভর্তি। ফুলের রঙ নীল এবং বেগুনিতে মেশানো। চৈত্র মাসের ঝাঁঝালো রোদ নেই তবু চারদিক আলো হয়ে আছে। যে বাচ্চা ক'টি তাকে ঘিরে আছে তাদের কারো পায়ে জুতো নেই।

এত সুন্দর পোশাক কিন্তু এরা দাঁড়িয়ে আছে খালি পায়ে। মতিন সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সব ক'টি বাচ্চা আগের মত এক সঙ্গে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মতিন সাহেব বুঝতে পারছেন—পুরো জায়গাটাই বিরাট একটা বাগান। এত বড় বাগানে এই কটি মাত্র শিশু। আর কেউ নেই। এরা গোল হয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ হাসি-হাসি। চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। এরা তাঁকে দেখে কী ভাবছে ? কোন জন্তু যে দেখতে মানুষের মতো ? এরকম হলে ছুটে গিয়ে বড় কাউকে নিয়ে আসা উচিত। তা তারা করছে না। কিংবা কে জানে হয়ত করেছে। তাদের ভেতর থেকে কেউ গেছে বড়দের খবর দিতে। এরা অপেক্ষা করছে। তবে এরা খুব যে ভয় পাচ্ছে তা না। ভয় পেলে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকত না। দূর থেকে দেখত। চোখে চোখ পড়ামাত্র চোখ নামিয়ে নিত। মতিন সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। আসুক, বড় কেউ আসুক।

তাঁর খিধে পেয়ে গেল। আজ ভোরে তিনি নাশতা না খেয়ে বের হয়েছেন। দুপুরেও কিছু খাননি। দু'ছটাক বাদাম কিনেছিলেন। সেই বাদামের ঠোঙা হাতে আছে। তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা বাদাম ভেঙে মুখে দিলেন। সবাই কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। মতিনউদ্দিন ঠোঙাটি ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাও, বাদাম। ঝাল মরিচ দিয়ে খেতে খুব ভাল। এবার আর তাঁর কথা শুনে সবাই এক সঙ্গে কথা বলে উঠল না। কেউ বাদামও নিল না। শুধু একজন একটু এগিয়ে এসে ঠোঙা থেকে বাদাম নিল। খোসা ছাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে মুখে দিল। সে এত ভয় পাচ্ছিল যে তার হাত-পা রীতিমত কাঁপছে। অন্য বাচ্চাগুলি শংকিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মতিন সাহেব ভেবে পেলেন না—এরা এত ভয় পাচ্ছে কেন। বাদাম কি তারা আগে কখনো দেখেনি ?

যে সাহস করে বাদাম খেয়েছে তার দিকে তাকিয়ে মতিন সাহেব বললেন, আমার নাম মতিনউদ্দিন। এই জায়গাটা কোথায় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাচ্চাগুলি এবারো ঠিক আগের মত করল। তিনি যা বললেন তারাও তাই বলল। তবে এবার একটু ব্যতিক্রম হল। কথা শেষ হওয়ামাত্র তারা সরে গেল। অনেকটা দূরে সরে গেল। যে ছেলেটি বাদাম খেয়েছে শুধু সে দাঁড়িয়ে রইল। মতিন সাহেব তিনজন বয়স্ক মানুষকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। এদের ভেতর দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই অদ্ভুত-দর্শন কিছু যন্ত্রপাতি। যন্ত্রগুলি থেকে মৌমাছির পাখা নাড়ার শব্দের মতো শব্দ আসছে। বয়স্ক মানুষ তিনটির চোখে-মুখে গভীর বিস্ময়।

মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই জায়গাটা কি তাও জানি না। এখানে কী করে আসলাম তাও জানি না। যদি অপরাধ করে থাকি, আপনাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মতিন সাহেব দু'হাত জোড় করলেন। বয়স্ক মানুষ তিনজনের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল। তারা কি তাঁর কথা বুঝতে পেরে হাসছে না মতিন সাহেবকে হাত জোড় করতে দেখে হাসছে ?

'স্যার আমার বাসা পল্লবীতে। এখন রিটায়ার করেছি তো। কিছু করার নেই তাই ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে ঘুরতে রমনা পার্কে এসে বেঞ্চিতে বসেছি— তারপরেই এই কাণ্ড। স্যার, এখন আমার অসম্ভব পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। জানি আমার কথা আপনারা কিছুই বুঝতে পারছেন না, তবু পানির তৃষ্ণার কথা না বলে পারলাম না।'

মতিন সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তিনি তাদের কোন কথা বুঝতে না পারলেও তারা তাঁর কথা বুঝতে পারছে। কারণ পানির কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বড় মেয়েটি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাঁর কাঁধে ঝুলানো বস্তু, যাকে মতিন সাহেব যন্ত্রপাতি বলে ভাবছেন, তার এক ফাঁক দিয়ে দুটি খুব ছোট ছোট কফির কাপের মত বাটি বের করল। বাটি ভর্তি তরল পদার্থ যা পানি নয়। পানির চেয়ে অনেক হালকা। রঙ, হালকা সবুজ। খেতে চমৎকার। মুখে নেয়ামাত্র সমস্ত মুখ ঠাণ্ডা ভাব হল। তৃষ্ণা দূর হয়ে গেল। মতিন সাহেব দু'টি কাপই শেষ করলেন। অন্য কাপটির তরল বস্তুর স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঝাঁঝালো-টক টক।

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আপনাদের ধন্যবাদ।

পুরুষদের একজন এগিয়ে এসে মতিন সাহেবকে হাতের ইশারায় বলল, তিনি যেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

প্রথমবারেই মতিন সাহেব তা বুঝলেন। তবু সে বারবার এটা বুঝাতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন, আপনার কথা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। শুধু যদি একটু বুঝিয়ে দেন আমি এখানে কীভাবে আসলাম—আপনারা কারা—তাহলে মনটা শান্ত হবে। আমার মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে।

তারা এই কথায় একসঙ্গে হাসল। মতিন সাহেব ভেবে পেলেন না—তিনি এমন কী বলেছেন যাতে এদের হাসি আসবে। বোঝাই যাচ্ছে তিনি কোন ভয়ংকর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। এতে হাসির তো কিছু নেই।

আরো তিনজন লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। এরা আগের তিনজনের মত হেঁটে আসেনি—গাড়িতে করে এসেছে। গাড়িগুলিকে কি গাড়ি বলা যায় ? হাওয়া গাড়ি ? কারণ গাড়িগুলি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এসেছে। গাড়ি ভর্তি নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। নতুন তিনজন মানুষ গাড়ি থেকে নেমেই মতিন সাহেবের চারদিকে যন্ত্রপাতি বসাতে লাগল। এমন সব বিকট আকৃতির যন্ত্র যে তাকালেই বুকে ধ্বক করে ধাক্কা লাগে।

মতিন সাহেবের চোখের ঠিক সোজাসুজি দশ ফুটের মত দূরে টিভি পর্দার মত পাতলা একটি পর্দা বসানো হয়েছে। মনে হচ্ছে এইটিই সবচে' জটিল যন্ত্র, কারণ ছয়জন মানুষের মধ্যে চারজনই এটি নিয়ে ব্যস্ত।

মতিন সাহেব বাচ্চাগুলিকে কোথাও দেখতে পেলেন না। এরা নিঃশব্দে সরে গেছে। শুধু যে বাচ্চাটি বাদাম খেয়েছে সে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত তাকেও নড়াচড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তার চারপাশে গোল করে সাদা রঙের দাগ দেয়া হয়েছে। ছেলেটি এই দাগের বাইরে যাচ্ছে না। বাচ্চাটাকে এখন ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আমি বসতে পারি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে।

এরা তার কথা বুঝতে পারল। সম্ভবত যন্ত্রপাতিগুলি ভাষা অনুবাদ করে দিচ্ছে কিংবা কে জানে হয়ত তারা মনের কথা বুঝতে পারে।

সবচে' বয়স্ক মানুষটি তাঁকে বসতে ইশারা করল। মতিন সাহেব বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাদা পর্দাটা নিচে নেমে এল। চোখের সোজাসুজি স্থির হয়ে গেল। তিনি ডান দিকে ফিরলেন। পর্দাও ডান দিকে সরে গেল। মজার ব্যাপার তো।

বয়স্ক লোকটি ইশারায় বলল, পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে পর্দায় কিছু দেখা যাবে। অথচ তিনি কিছুই দেখছেন না। লোকগুলি মনে হয় এতে খুব হতাশ হচ্ছে। মতিন সাহেবের আবার পানির পিপাসা পেয়ে গেল। একটু আগে পানি চেয়েছেন। আবার চাইতে লজ্জা লাগছে। তাছাড়া এরা সবাই পর্দাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। হাওয়া গাড়িতে আরো তিনজন মানুষ এল। এখানকার ছ'জন থেকে তিনজন ফিরে গেল। এই তিনজন সম্ভবত পর্দার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। এখন নতুন তিনজনই কাজ করছে। আগের তিনজন একটু দূরে হতাশ মুখে দাঁড়ানো। মনে হচ্ছে পর্দাটা ঠিকঠাক করা তাদের কাছে খুব জরুরি।

মতিন সাহেব মাথায় আচমকা একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন। নিজের ছবি। দু' হাত মেলে দশটি আঙুল বের করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এর মানে কী !

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আমি ছবি দেখতে পাচ্ছি। নিজের ছবি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবি মুছে গেল। পর্দায় দেখা গেল তার পাশে বসে থাকা বাচ্চাটির ছবি। সেও আঙুল মেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার— এই ছেলেটির প্রতি হাতে চারটি করে মোট আটটি আঙুল। তিনি পর্দা থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশে বসে থাকা ছেলেটির দিকে তাকালেন। আসলেও তাই। এর হাতে চারটি করে আঙুল। পায়েও তাই।

তিনি চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির দিকে তাকালেন। এদেরও সবার হাতে চারটি করে আঙুল। পর্দার ছবির অর্থ এখন পরিষ্কার হচ্ছে—এরা বলতে

চাচ্ছে—আমরা দেখতে অবিকল তোমাদের মত হলেও কিছু পার্থক্য আছে। এই হচ্ছে সেই পার্থক্য।

এখন আরো সব পার্থক্য দেখানো হচ্ছে—এগুলি মতিন সাহেব কিছুই বুঝছেন না। তারা চলে গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডি এন এ, আর এন এ তে। পুরো জিনিসটি যদিও দেখানো হচ্ছে ছবিতে তবু মতিন সাহেব কিছু বুঝলেন না। লাজুক গলায় বললেন,

'স্যার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি আর্টস-এর ছাত্র। বি. এতে আমার ছিল লজিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইসলামের ইতিহাস।'

পর্দার ছবি মুছে গেল—এখন অন্য ছবি আসছে। এই ছবিতে বাদাম খাওয়া বাচ্চাটিকে বাগানে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। এটাই সেই বাগান। বাচ্চাটি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে সে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে—সে উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছে। আরো কয়েকটি শিশুর সঙ্গে তার দেখা হল। এবার সে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে। অন্য শিশুরাও আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তারা যে জিনিসটি দেখে ভয় পেয়েছে এবার সেটিকে দেখা যাচ্ছে—জিনিসটি হচ্ছে মতিন সাহেব।

পর্দায় দেখানো হচ্ছে মতিন সাহেবের এই জায়গায় আসার ছবি। মনে হচ্ছে দূরে ক্যামেরা বসিয়ে পুরো জিনিসটারই ছবি তোলা হয়েছে। এখন সে ছবি দেখানো হচ্ছে।

মতিন সাহেব দ্বিতীয় দফায় মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদের কথা বুঝতে পারলেন। পরিষ্কার শুনলেন মাথার ভেতরে কে যেন বলছে—

'আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন ? আমরা নানান ভাবে চেষ্টা করছি যাতে আপনি আমাদের কথা বোঝেন। আমরা আপনার চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পারছি না। শেষ চেষ্টা হিসাবে ইরিওক্রোম পর্দা ব্যবহার করছি। এই পর্দায় তীব্র শক্তির রেডিয়েশন ব্যবহৃত হয় যা আপনার মস্তিষ্কের নিওরোনের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই এই পর্দ-আমরা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারব না। আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন ?'

'পারছি।'

'অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

'আপনারা কারা ?'

'আপনি এবং আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তের অধিবাসী। আপনার বাসস্থান যাকে আপনি পৃথিবী বলেন তার দূরত্ব আমাদের এখান থেকে প্রায় এক কোটি আলোকবর্ষ।'

'আমি এখনে কী করে এলাম ?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানীরা একটি থিওরি দিয়েছে—সেই থিওরি আপনি চাইলে আপনাকে বলতে পারি।'

'আমি থিওরি বুঝব না—আমি বলতে গেলে একজন মূর্খ মানুষ। বি.এ পাস করেছি থার্ড ডিভিশনে। তাও প্রথমবারে পাস করতে পারিনি, ইংরেজিতে রেফার্ড ছিল।'

'এই থিওরি যে কেউ বুঝতে পারবে। আপনি পারবেন। বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে নিজেদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কিছু থিওরি তৈরি করেন। এটিও সে জাতের থিওরি। বিজ্ঞানীরা বলছেন—প্রকৃতির অতি সুশৃঙ্খল নিয়মেও মাঝে মধ্যে ভুল হয়ে যায়। ভুল করে প্রকৃতি। আপনার ক্ষেত্রেও এরকম ভুল হয়েছে। যার জন্যে অকল্পনীয় দূরত্ব থেকে আপনি উপস্থিত হয়েছেন এখানে। তবে প্রকৃতি অতি দ্রুত তার ভুল ঠিক করে। আপনার ক্ষেত্রেও তাই করবে বলে আমাদের ধারণা। আপনি যেখান থেকে এসেছেন আবার সেখানে ফিরে যাবেন। প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করবে। আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অতি উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আমরা আপনাকে ফেরত পাঠাতে পারছি না।'

'যদি প্রকৃতি তার ভুল ঠিক করতে না পারে তাহলে কী হবে?'

'আপনাকে এখানেই থেকে যেতে হবে।'

'স্যার, আমার কোন অসুবিধা নেই। দেশ-বিদেশ দেখার আমার খুব শখ।'

'আপনার এই শখ আমরা মেটানোর চেষ্টা করছি। পর্দায় আপনি আমাদের এই গ্রহ দেখতে পাবেন। তার প্রতিটি সুন্দর জায়গা আপনাকে দেখানো হবে। তবে যে কোন মুহূর্তে আপনি হয়ত আপনার জায়গায় ফিরে যাবেন। দয়া করে আমাদের কথা মনে রাখবেন। আপনার দেশের বিজ্ঞানীদের বলবেন আমাদের কথা।'

'আমি বললে লাভ হবে না, স্যার। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া আমি কোন বিজ্ঞানীকে চিনি না। একজনকে শুধু চিনি—আব্দুস সোবহান—খিলগাঁও হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক। বোটানিতে এম.এসসি. ফার্স্ট ক্লাস।'

'শুনুন মতিন সাহেব, আপনার এই গ্রহে আগমন একটি বিরাট ঘটনা। এই উপলক্ষে সমগ্র গ্রহে একদিনের ছুটি দেয়া হয়েছে। এই গ্রহের প্রতিটি প্রাণী বসে আছে ত্রিমাত্রিক টিভি সেটের সামনে। এই মুহূর্তে সবাই দেখছে আপনাকে। এই গ্রহে আপনার আগমন চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এই গ্রহের সবচে' বড় সড়কটির নাম রাখা হচ্ছে আপনার নামে—সড়কের দু'মাথায় থাকবে আপনার দুটি ইরিডিয়ামের মূর্তি।'

'আমাকে লজ্জা দেবেন না, স্যার।'

'লজ্জা দেয়ার কোন ব্যাপার নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার এই গ্রহে আগমন যে কত বড় ঘটনা তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছায়াপথে একই ধরনের দু'টি প্রাণের উদ্ভব হয়েছে এটা যে কত বড় ঘটনা আপনি তা অনুমানও করতে পারবেন না।'

'একই ধরনের প্রাণী না স্যার—আঙুলে বেশকম আছে।'

'এই তফাৎ সামান্য—অতি সামান্য।'

'একটা ছোট কথা জিজ্ঞেস করি, স্যার ?'

'করুন।'

'আপনি বলেছেন প্রকৃতি ভুল করে। প্রকৃতির কি ভুল করা উচিত ?'

'না উচিত নয়। হয়ত প্রকৃতি কোন ভুল করেনি। সে ইচ্ছা করেই আপনাকে এখানে এনেছে। অন্য কোথাও আপনাকে নিতে পারত। তা নেয়নি। এমন এক গ্রহে এনেছে যার তাপমাত্রা আপনার পৃথিবীর মত। যার অক্সিজেনের পরিমাণও আপনার গ্রহের অক্সিজেনের কাছাকাছি।'

'মতিন সাহেব পর্দা থেকে দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে ফিরিয়ে নিলেন—তাকালেন চারদিকে। আশ্চর্য ! কেউ নেই। শুধু বাদাম খাওয়া বাচ্চাটি বসে আছে। যে লোকগুলি যন্ত্র ঠিক করছিল তারাও নেই। চারদিকে সুনসান নীরবতা। মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, স্যার, ওরা কোথায় ?

'সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'কেন ?'

'কারণ আমাদের বিজ্ঞানীদের ধারণা—আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আপনার চারপাশের চৌম্বকক্ষেত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। বায়ুতে আয়নের পরিমাণ বাড়ছে।'

'ছোট বাচ্চাটিকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন কেন ?'

'আপনাকে যখন এখানে পাঠানো হয় তখন ছোট বাচ্চাটি আপনার পাশে ছিল। অবিকল আগের অবস্থা বজায় রাখার জন্য বাচ্চাটিকে আপনার পাশে রাখা হয়েছে।'

'এর কোন ক্ষতি হবে না তো ?'

'সম্ভবত না। আপনাকে আমাদের উচ্চতর বিজ্ঞানের কিছু কথা শিখিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। আপনি আপনার পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের তা শেখাতে পারতেন। ক্যানসারের চিকিৎসা কি শিখিয়ে দেব ?

'দরকার নেই, স্যার। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

'তারচেয়েও বড় কথা আপনি কিছু মনে রাখতে পারবেন না।'

'সত্যি কথা বলেছেন। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।'

'চৌম্বকক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে—আপনি সম্ভবত চলে যাচ্ছেন। পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকুন। দেখুন, আমাদের গ্রহ দেখুন—শেষবারের মত দেখুন।'

মতিন সাহেব পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে এই বিচিত্র গ্রহ দেখলেন—দেখলেন তার ভূগর্ভস্থ বিশাল নগরী, দেখলেন তুষারঢাকা পর্বতমালা, দেখলেন বনভূমি, দেখলেন এই গ্রহের প্রাণদায়িনী সূর্য যার আলো কিঞ্চিৎ নীলাভ।

তাকে শুনানো হল তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত। দেখানো হল মহান সব শিল্পকর্ম। আহ্ কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা ! মতিন সাহেব ইরিডিয়ামের তৈরি তাঁর দুটি মূর্তিও দেখলেন। কী বিশাল মূর্তি। আগামী লক্ষ বছর এই মূর্তির কিছু হবে না। এই গ্রহের অদ্ভুত সুন্দর মানুষগুলি তাঁর মূর্তির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাবে।

'হে ভিন গ্রহের মানুষ, আমাদের ধারণা আপনার বিদায়ের মুহূর্ত সমাগত। চৌম্বকক্ষেত্র সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। বিদায়, বিদায়। এই গ্রহের সব ক'টি মানুষ এক সঙ্গে বলল—বিদায়, বিদায় !

মতিন সাহেব হঠাৎ এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করলেন। শরীরের প্রতিটি রক্ত কণিকা এক সঙ্গে কেঁপে উঠল। তারপর সব আগের মত হয়ে গেল। তিনি দেখলেন রমনা পার্কের বেঞ্চিতে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। হাতে বাদামের ঠোঙা। বাদামওয়ালা টাকার ভাংতি নিয়ে এসেছে। তিনি বাদামওয়ালাকে চারটা টাকা দিলেন। তাঁর রুটিনের ব্যতিক্রম হল না। দুপুরে বেঞ্চিতে ঘুমালেন। বিকেলে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে বাসায় ফিরলেন।

নামাযের সময় হয়েছে তিনি বারান্দায় বসে বদনার পানিতে অযু করছেন। তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন—ওকী ! ওকী !

মতিন সাহেব বললেন, কী হল ?

'তোমার হাতে চারটা আঙুল কেন ?' মতিন সাহেব হাতের দিকে তাকালেন। আসলেই তাই। দুটি হাতেই চারটি করে আঙুল। শুধু হাতে নয়। পায়েও তাই।

'কী হয়েছে তোমার ? এসব কী ?'

মতিন সাহেব উদাস গলায় বললেন, জানি না।

'কী বলছ তুমি ! কী সর্বনাশের কথা !'

মতিন সাহেব বললেন, সর্বনাশের কী আছে ? চারটা আঙুলে অসুবিধা তো হচ্ছে না।

তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে অযু করে যাচ্ছেন। আঙুল চারটা হয়ে যাওয়ায় তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর হচ্ছে না। তিনি জানেন প্রকৃতি ভুল করে না। ঐ গ্রহ থেকে এখানে ফিরিয়ে আনার সময় প্রকৃতি এই সামান্য পরিবর্তন করেছে। নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন ছিল। অন্তত তিনি নিজে তো বুঝছেন তাঁর জীবনে যা ঘটেছে তা স্বপ্ন নয়—বাস্তবেই ঘটেছে। প্রকৃতি তার প্রমাণ রেখে গেল।

তাছাড়া চার আঙুলে হাতটাকে দেখাচ্ছেও সুন্দর !